পালকি

বোয়ালজুর গ্রামের সতীনাথ মুখোপাধ্যায় মোটামুটি সমপন্ন গৃহস্থ - স্ত্রী, বছর সাতেকের মেয়ে ননী, দু বছরের ছেলে ভানু ও মাকে নিয়েই ছোট সংসার। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়রা কুলীন ব্রাহ্মণ তাই ননীর বাড়ির বাইরে যাওয়া একেবারেই বারণ - বাড়ির উঠোন, পেছনের বাগান ও পুকুর ঘাটের মধ্যেই ওর পৃথিবী - মানুষ সমান উঁচু ফাঁটা বাঁশের বেড়ার বাইরের জগৎ ওর কাছে প্রায় অপরিচিত। তবে উঠোনের কোনায় বেড়ার পাশে করমচা গাছের পেছনে দাঁড়ালে বাড়ি থেকে বোঝা যায় না - ওখানে বাঁশের বেড়ার গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো করে নিয়েছে যার ভেতর দিয়ে বাইরের জগৎ ওর সামনে খুলে যায়। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে লোকজন, গরু ছাগলের যাতায়াত - কত মুখ ওর চেনা হয়ে গিয়েছে আর ওদের ও নিজস্ব নামও দিয়েছে। সকালে ঘাড়ে লাঙ্গল নিয়ে চাষী চলে বলদের দড়ি ধরে মাঠে চাষ করতে, গরু, মোষের দল নিয়ে রাখালরা চলে ওদের মাঠে ঘাস খাওয়াতে, তারপর পড়ুয়ার দল হাতে শ্লেট আর বই নিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে যায় পাঠশালাতে, গরুর গাড়িতে করে লোকে কত জিনিষ নিয়ে যায় কোথায় কে জানে, ধান কাটার সময় হলে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান, খড় যায় চাষীর বাড়ি, ছাতা মাথায় পুরুত মশাই মস্ত টিকি নাড়তে নাড়তে চলেন কোন যজমানের বাড়ি, আরো কত লোক - বিভোর হয়ে এদের দেখতে দেখতে সময় কি করে কেটে যায় ননী জানে না। মাঝে মাঝে বাবার হাত ধরে গ্রামের চণ্ডী মন্ডপে পূজো দেখতে যাওয়া আর নয় তো ওর সই বকুল ফুলের বাড়ি যাওয়ার মধ্যেই বাইরের পৃথিবীর সাথে ওর যোগাযোগ। তবে গ্রামে যাত্রা এলে ননীর সব থেকে আনন্দ - তখন গরুর গাড়ি করে মা ঠাকুমার সাথে যাত্রা দেখতে যায় - সীতা হরণ, কংস বধ, এই সব। যাত্রা অবশ্য কোনদিনই ওর পুরো দেখা হয় না আদ্ধেক দেখার পর ঠাকুমার কোলে ঘুমের দেশে। ফিরে এসে সেই যাত্রার রেশ চলে অনেক দিন - ওই নিয়ে হাজারো প্রশ্ন ঠাকুমাকে - মনে মনে যাত্রার নায়ক নায়িকা সেজে একা একাই পার্ট বলে আর নয়তো ওর পুতুলদের দিয়েই যাত্রা করায়। ননীর সমস্ত দিন কাটে ছোট্ট ভাইকে সামলে আর নয়তো উঠোনের কোনে ওর পুতুল ঘরে - ঠাকুমা ন্যাকড়া দিয়ে অনেক পুতুল বানিয়ে দিয়েছে - ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা আর ওদের নিয়েই ওর ছোট্ট পুতুল-সংসার - ওদের ঘুম পাড়ানি গান গাইতে গাইতে ঘুম পাড়ায়, ওদের দুধ খাওয়ায় - ছোট ছোট মাটির হাড়িতে পাতা দিয়ে রান্না করে ওদের জন্য। তাও ভালো না লাগলে উঠোনে দাগ কেটে একা একাই এক্কা দোক্কা খেলে। মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায় পেছনের বাগানে বড় বড় আম কাঁঠালের গাছের তলায় - ওখানেই ওর কল্পনার ব্যাঙামা ব্যাঙামীর দেশ, রাজকুমারের সাথে আপন মনে গল্প করে যায় - পুকুর ঘাটে বসে মাছেদের মুড়ি খাওয়ায়, ওদের ঘাই মারা দেখে - কখনও বা লুকিয়ে পেয়ারা গাছে উঠে

পেয়ারা খায় তবে মা দেখলে চেঁচাতে থাকে,

'ধিঙ্গী মেয়ে, দুদিন পরে শ্বশুর যাবি তখন লোকে কি বলবে শুনি - গাছ থেকে পড়ে কোন খুঁত হলে তো আর বিয়েই হবে না।'

সারা দিনে উঠতে বসতে এই শ্বশুর বাড়ির কথা যে কত বার শুনতে হয় তার ইয়াত্তা নেই - ওর কাছে শ্বশুর বাড়ি একটা ভয়ানক জায়গা আর ওখানে মেয়েরা একটু বড় হলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় সারা জীবনের জন্য বন্দী হয়ে থাকতে - সেখানে শাশুড়ী নামের এক ভয়ানক চেহারার মহিলা হাতে যমদূতদের মত ডাঙ্গস নিয়ে বউকে পেটায় আর ননদিনীরা উঠতে বসতে চিমটি কাটে। এই কল্পনার জগৎ নিয়েই ননীর দিন কেটে যায় - সন্ধ্যে হলেই ঠাকুমার কোলের কাছে গুটি শুঁটি মেরে বসে কখন ঠাকুমা জপ শেষ করে গল্প শোনাবে - ধীরে ধীরে ঘুমে ঢলে পড়লে মা এসে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দেয় - তারপর আবার স্বপ্নের জগতে। মাসে হয়তো একদিন বাবা দিয়ে আসে বকুল ফুলের বাড়ি নয়তো বকুল ফুল আসে ওদের বাড়ি - সারা দিন ধরে ওরা দুজনের কল্পনা ভাগ করে নেয় - পুতুলের বিয়ে দেয় আর তারপর পুতুল মেয়েকে পুতুল শাশুড়ী ডাঙ্গস দিয়ে মারলে কাঁদতে থাকে। সেদিনটা যে কি করে এত তাড়াতাড়ি কেটে যায় বুঝতেই পারে না - ওদের কত গল্প অসমাপ্ত থেকে যায়। সে বছরই বকুল ফুল যখন বিয়ে হয়ে দূরের কোন গ্রামে চলে গেলো ননী মাটিতে পড়ে কেঁদেছিলো - ওর যে আর কোন বন্ধু রইলো না। এখন একমাত্র সহায় ঠাকুমা - বাবাকে দেখা তো ভাগ্যের কথা আর মা সংসার ও ছোট ভাইকে নিয়ে সারা দিনে ফুরসতই পায় না ওর সাথে কথা বলার। কোন দিন হয়তো হঠাৎই বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে ননী ওকে ডেকে ওর পুতুল ঘরে এনে বসায় তারপর ওর ছোট ছোট হাড়িতে ধুলো, পাতা এই সব দিয়ে ভাত তরকারি রান্না করে খাওয়ায়। সতীনাথ মেয়েকে ভীষণ ভালোবাসেন - ওর সুন্দর ননী যার পান পাতার মত ছোট্ট ফর্সা মুখে ডাগর ডাগর চোখ, পাতলা নাক, এক মাথা চুলের ঢাল পিঠ বেয়ে পড়েছে - একে কোন রাজপুত্রের সাথে বিয়ে দেবেন - ননী বাড়ি থেকে চলে গেলে ওর তো চার দিক অন্ধকার - শ্বশুর বাড়িতে যদি কষ্ট দেয় তবে তো সহ্য হবে না। যদিও গিন্নী কিছুদিন ধরেই তাড়া দিচ্ছেন মেয়ের জন্য ছেলে খোঁজার ব্যাপারে তবুও সতীনাথ গড়িমসি করছেন - মেয়েটা যতদিন পারে ওর কাছেই থাক। এবার ওর মা ওকে ধরলেন,

'সতু, আর কত দিন মেয়েটাকে আইবুড়ো করে রাখবি রে - কুলিনের মেয়ে - গ্রামে তো ঢিঁ ঢিঁ পড়ে যাবে। সাত পেরিয়ে আটে পড়লো - এর পর তো ভালো বংশের ছেলেও পাবি না - যা তা ঘরে তো দিতে পারা যায় না। এবার একটু গা লাগিয়ে খোঁজ বাবা - হুঁট করলেই তো আর ছেলে পাওয়া যায় না।'

মার তাড়া খেয়ে সতীনাথ ছেলে খুঁজতে লেগে পড়লেন - ছেলে ও বংশ দুটোই একসাথে পছন্দ আর হয় না - এমন কি দু তিন জন ঘটককেও আশে পাশের গ্রামে ছেলে খুঁজতে লাগিয়েছেন।

এখন মা ননীকে নিয়ে পড়েছে - যখন তখন রান্না ঘরে ননীর ডাক পড়ে। লাল ডুরে

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে মার সাথে উনুন ধরানো, কুটনো কোটা, তরকারি নাড়া, ঘর ঝাড়ু দেওয়া এই সব কাজে।

'ননী, বাড়ির কাজ কর্ম না শিখলে শ্বশুর বাড়িতে তো আমাদেরই বদনাম হবে - বলবে কোন কাজ না শিখিয়ে আনকোরা মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। - - ধিঙ্গীর মত লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটবি না, এক্কা দোক্কা খেলবি না - হাঁটা, চাল চলন ঠিক কর। - - ড্যাব ড্যাব করে লোকের দিকে তাকালে সবাই খারাপ মেয়ে বলে। - - বড়দের সামনে মাথা নিচু করে থাকতে হয়। - - -'

এই রকম হাজারো উপদেশ সারা দিন ধরে চলতে থাকে। বেশ ছিলো আগে - ঠাকুমা বাবাকে বিয়ের জন্য তাড়া দেওয়ার পর থেকে ওর জীবনটা পাল্টে যাচ্ছে - দিনভর শুধু শ্বশুর বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি - ডাঙ্গসের ভয় ওর দিন দিন বাড়তেই থাকে। কেন মা বাবা ওকে অন্য বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে জোর করে? এখানে তো ভালোই ছিলো - কোন অন্যায় করে নি যে এত বড় শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। ওর ছোট্ট মাথায় এর কোন উত্তর নেই তাই ঠাকুমাকে ধরে পড়লো।

'ঠাম্মা, মেয়েদের বিয়ে করতে হয় কেন?'

'সেকি রে, একি অলুক্ষুণে কথা! ভগবান তো মেয়েদের পাঠিয়েছেন অন্য বাড়ির জন্যই - সেটা জানিস না। মা বাবার কাজ হলো মেয়েকে বড় করে বিয়ে দেওয়া - মেয়েরা তো শ্বশুর বাড়ির জন্যই - মেয়ের ওপর তো মা বাবার কোন দাবি নেই - ওরা তো পরের ঘরের জন্যই - মেয়েদের কাজই হলো স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ীর সেবা করা, রান্না বান্না করা, সংসার সামলানো, ছেলে মেয়ে মানুষ করা - এই তো মেয়েদের জীবন আর আদ্যিকাল থেকে এই নিয়মই তো চলে এসেছে। দ্যাখ, আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ - তোর বিয়ে সময় মত দিতে না পারলে সমাজের কাছে তোর বাবার মাথা যে হেঁট হয়ে যাবে - সেটা কি ভালো কথা - তুই-ই আমাকে বল।'

এর পরে আর কোন প্রশ্ন ওঠে না - ননী চুপ করে কিছু সময় ভাবলো -

'আচ্ছা ঠাম্মা, তোমার কোন নাম নেই?'

ঠাম্মা ফোকলা মুখে হাসলো,

'আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! মেয়েদের তো নিজের কোন পরিচয়ই নেই। ছোটবেলায় মা বাবারা আদর করে কোন নাম দেয়, যেমন তোর নাম ননী, তবে বাইরের কজন জানে - তোকে তো সবাই সতুর মেয়েই বলে। বিয়ের পর মেয়েরা হয়ে যায় অমুক বাড়ির বৌ, তারপর ছেলে মেয়ে হলে অমুকের মা, এই রকম। এই দ্যাখ না, আমি এখন কেবলই সতুর মা - ছোট বেলার সেই নাম কোথায় হারিয়ে যায় কেউ কি জানে। বাবা তো আমাকে গৌরীদান করেছিলো - ছয় বছর বয়েসেই বিয়ে দিয়েছিলো। আমার কি ছাই মনে আছে মা বাবা আমাকে কি নামে ডাকতো?'

'ঠাম্মা, আমি আরো কিছুদিন তোমাদের কাছে থাকি না?'

ঠাকুমা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বললো,

'ওমা, সে কি কথা রে! তুই এখন সাত পেরিয়ে আটে পড়লি - কুলীন বাড়ির মেয়ে - আর দেরি করলে তো তোর বাবাকে যে নরকে যেতে হবে - জানিস না গৌরীদান করার মত পূণ্যি

আর কিছুতে নেই - সতু তো তাও দেরি করে ফেলেছে। তোর সই বকুল ফুলের বিয়ে তো সাত বছর বয়েসেই হয়ে গিয়েছে।'

এই সব অকাট্য যুক্তির কাছে আর কোন কথাই ওঠে না তার উপর ও ভাবতেই পারছে না ওর বাবাকে নরকে যমদূতরা ডাঙ্গস দিয়ে মারছে - এর চেয়ে ভালো বিয়ে করা - তাহলে তো বাবা বেঁচে যাবে - বরং আমিই শাশুড়ীর ডাঙ্গস খাবো - সেই ভালো। ননীর ছোট্ট মাথায় এর থেকে বেশী আর কিছু এলো না - ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে চলে গেলো পেছনের পুকুর ঘাটে তবে মনে মনে ঠিক করলো মা বাবার দেওয়া ননী নামটা ও কিছুতেই ভুলবে না।

কিছুদিনের মধ্যে ঘটক খবর নিয়ে এলো এখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরে দুধপাতিল গ্রামের বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়ের উপযুক্ত ছেলে আছে - নবকৃষ্ণ - ননীর সাথে মানানসই হবে - বয়স বছর চৌদ্দ - চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে - বিশ্বম্ভরের ছোট মেয়ের বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছে সেই হিসাবে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় কবিরাজ - জমি জমা ভালোই আছে - সচ্ছল সংসার। মায়ের কথা মত একদিন ভোর বেলা ঘটককে নিয়ে সতীনাথ গরুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন দুধপাতিল গ্রামের দিকে। সন্ধ্যের মুখে ফিরে এসে বললেন শুভ খবর - বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়রাও খুবই আগ্রহী - ছেলে দেখতে রাজপুত্তুর না হলেও ননীর সাথে ভালোই মানাবে - পড়াশুনায় খুব মন। দিন দশেক পর বিশ্বম্ভর বাবুরা সদলে ননীকে দেখতে এলেন - এক নজরেই ওদের পছন্দ হয়ে গেলো। বিয়ের দিন ঠিক হতেও দেরি হলো না - বাড়িতে সবাই বিয়ে নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত - শুধু ছোট্ট ননীর মুখের হাসি দিন দিন শুকিয়ে এলো - দিনের বেশীর ভাগ সময় ওর কাটে পুকুর ঘাটে একা বসে - মনে মনে নিজেকে তৈরি করছে শাশুড়ীর ডাঙ্গস খাওয়ার জন্য - তা হলে তো বাবাকে যমদূতদের হাতে ডাঙ্গস খেতে হবে না। একদিনই শুধু ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করেছিলো,

'ঠাম্মা, শ্বশুর বাড়িতে কি শাশুড়ী ডাঙ্গস দিয়ে মারবে।'

ঠাকুমা হেসে বলেছিলো,

'তা কেন রে - দেখিস শাশুড়ী তোকে কত আদর করে - তখন তুই তো আমাদের কথা ভুলেই যাবি।'

ঠাম্মার এই একটা কথা ওর মনে একটু আশার আলো দিয়েছে। মা এখন ওকে নিয়ে পড়েছে ঘসে মেজে আরও সুন্দর করার জন্য - রোজ স্নানের পর মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে সুন্দর করে বেঁধে দেয় - মার চিন্তা ননী কি করে ওর এই পিঠ ছাপানো চুল নিজে বাঁধবে।

দেখতে দেখতে বিয়ের দিন এসে গেলো। বরযাত্রীরা এসে প্রথমে গ্রামের চণ্ডী মন্ডপেই উঠবে - ওখানে ওদের জন্য গরম গরম জিলিপি আর সিঙ্গাড়ার ব্যবস্থা হয়েছে আর সন্ধ্যেবেলা বরকে ওখান থেকে পালকি করে নিয়ে আসা হবে - বিয়ের পরদিন সকালে বরযাত্রী লুচি আর আলুর দম খেয়ে রোওয়ানা হবে। দুদিন আগে থেকে বাড়িতে ভিয়েন বসেছে মিষ্টি তৈরি আর রান্নার জন্য। সময় যে কি করে কেটে গেলো ননী জানে না - বিকেলে ওকে সুন্দর করে চন্দন

দিয়ে সাজিয়ে একটা ভারি বেনারসি শাড়ি পরানো হয়েছে যার ওজনে বেচারি হাঁটতেও পারছে না - মা ধরে ধরে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলো - ননী মাথা আর তুলছে না - কি করবে দুই চোখ যে জলে ভরে আছে। শুধু শুভ দৃষ্টির সময় এক ঝলক একটা হাসি হাসি ঝাপসা মুখ দেখতে পেলো তারপর অনেকের নানা রকম মন্তব্যের মধ্যে কাঁপা কাঁপা হাতে মালা বদল - বাসরে বসতে না বসতে ননী ঘুমিয়ে পড়েছে তারপর আর কিছুই জানে না। পরদিন ভোর বেলা থেকে আবার তোড় জোড় শুরু - মেয়ে বিদায়ের ব্যাপার - ওদের যে প্রায় চার ক্রোশ পথ যেতে হবে তিনটে গ্রাম ছাড়িয়ে - তাড়াতাড়ি না বেরুলে সন্ধ্যের আগে দুধপাতিল পৌছাতে পারবে না। বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায় বরযাত্রীদের তাড়া দিয়ে তৈরি করাচ্ছেন - বিয়ের জিনিষপত্র নিয়ে রাত করা একদম উচিত হবে না। নবকৃষ্ণের পেছন পেছন ননীকে ফুল দিয়ে সাজানো চার কাহারের পালকিতে তুলে দেওয়া হলো - মা চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে নবকৃষ্ণের হাত ধরে বললো,

'দ্যাখো বাবা, মেয়েটা যেন কষ্ট না পায়।'

ঠাম্মা একটা পোঁটলায় করে তুলে দিলো ননীর পছন্দের মোয়া আর নাড়ু রাস্তায় খাবার জন্য। ননীর চোখের জল আর বাঁধ মানছে না - মুখের সুন্দর করে সাজানো চন্দনের ফোঁটা আদ্ধেকের ওপর ধুয়ে মুছে গিয়েছে - কে যেন ওর হাত মার গলা থেকে ছাড়িয়ে দিলো - এ বাড়ির সাথে শেষ সমপর্কও ছিঁড়ে গেলো। সতীনাথ নতুন বেয়াইয়ের হাত জড়িয়ে ধরা গলায় বললেন,

'বেয়াই মশাই, মেয়েটাকে দেখবেন - এখন থেকে তো ও আপনারই মেয়ে - -'

এর বেশী কথা গলা দিয়ে আর বেরুলো না।

ধীরে ধীরে বরযাত্রীদের গোটা আষ্টেক গরুর গাড়ি আর কনে পক্ষের গোটা ছয়েক গরুর গাড়িতে বিয়ের মাল পত্র সহ কনে পক্ষের কয়েক জন শোভাযাত্রা করে বেরুলো আর ওদের মাঝখানে হুঁম-না হুঁম-না করতে করতে চার কাহারের পালকি - কাহারদের চলার তালে তালে পালকি দুলছে। সতীনাথ সব গাড়িতেই ঝুড়ি ভরে অমৃতী, লুচি, তরকারি, মোয়া তুলে দিয়েছেন রাস্তায় খাবার জন্য। ননীকে অঝোরে কাঁদতে দেখে নবকৃষ্ণ ওর হাত ধরে বললো,

'কেঁদো না, আমি তো আছি।'

ননীর কান্না আরো বেড়ে গেলো - নবকৃষ্ণ ওর হাত ধরে বসে রইলো। একটু পর ননীর মনে হলো ওই হাতের ওপর ভরসা করা যায় - ধীরে ধীরে মুখ তুলে নবকৃষ্ণের দিকে তাকাতে ও আস্তে করে নিজের জামা দিয়ে ননীর গাল মুখ মুছিয়ে দিলো।

'দেখলে না - একটু আগেই একটা পুকুরে পানকৌড়ি ডুব দিচ্ছিলো। আমরা না এখন তোমাদের গ্রামটা ছাড়িয়ে এসেছি।'

বলে পালকির দরজার পর্দাটা একটু তুলে দিতে মুহূর্তের মধ্যে ননীর সামনে বাইরের পৃথিবী নিজেকে মেলে ধরলো। রাস্তার দু ধারে যত দূর দেখা যায় ধান ক্ষেত তবে ধান কাটা হয়ে যাওয়াতে শুধু গোড়া গুলো রয়ে গিয়েছে আর অনেক গরু মোষ সেগুলো খাচ্ছে। মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা, ঘুঘু আরও অনেক অচেনা পাখী পড়েছে জমিতে পড়ে থাকা ধান খুঁটে খাওয়ার

জন্য। ছোট ছোট বাছুর গুলো কাহারদের হুঁম-না হুঁম-না আওয়াজ শুনে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে দৌড়াচ্ছে আর পাখীরাও উড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসছে। অনেক জমিতে চাষীরা মাটি কোপাতে শুরু করেছে নতুন ফসল চাষের জন্য আর পাশের ছোট খাল থেকে কি সুন্দর বাঁশের কল দিয়ে জল তুলে জমিতে দিচ্ছে মাটি নরম করার জন্য - একটা মোটা বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে আর একটা লম্বা বাঁশকে ধরে টানছে আর সেটার মাথায় লাগানো সুপুরি গাছের খোলে করে জল ওপরে উঠে জমিতে পড়ছে - অবাক হয়ে ননী সেই কলটাকে পেরিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত দেখলো। বিয়ের শোভাযাত্রা দেখে মাঠের চাষীরাই কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে - রাস্তার কাছের দু এক জন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'কোন গ্রামের বর কনে চলেছে গো?'

কাহাররা হুঁম-না হুঁম-নার ফাঁকে জানালো,

'দুধপাতিল গ্রামের বিশ্বম্ভর চট্টোর ছেলে-এ - বুয়ালজুর থেকে বিয়ে করে ফিরছে গো-ও।'

রাস্তার পাশের একটা বিলের জল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে আর তার মধ্যে প্রচুর বক, লম্বা লম্বা ঠোঁট ওয়ালা সারস, কাদাখোঁচা আর আরো অনেক পাখী লম্বা ঠোঁট দিয়ে কাদার ভেতর থেকে পোকা, ব্যাঙ এই সব বের করে খাচ্ছে। সারস গুলোর ঠ্যাং দুটো মস্ত লম্বা আর যখন উড়ছে ওদের পাখা দুটো কি বিরাট বড় হয়ে যাচ্ছে - পা আর মাথা এক লাইনে চলে আসছে। মাঝে মাঝে গাছে বসে থাকা মাছরাঙা বিলের অল্প জলে ঝাঁপিয়ে ঠোঁটে ছোট মাছ তুলে নিচ্ছে - কি নজর রে বাবা! নীল আকাশে অনেক চিল উড়ছে তবে মনে হয় ওদের নজরও বিলের জলের দিকে। ননী নবকৃষ্ণের হাত টেনে বললো,

'দ্যাখো, দ্যাখো সারস গুলো কত্ত বড় - বসে থাকলে বোঝাই যায় না।'

'তুমি দেখো নি আগে?'

'আমার তো বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ ছিলো - দেখবো কি করে? সারা দিন তো একা একাই খেলতাম - আমার তো কোন বন্ধু ছিলো না।'

'এখন থেকে আমি তোমার বন্ধু হলাম - আমরা এক সঙ্গে বসে গল্প করবো, লুডো খেলবো।'

ননী মাথা হেলিয়ে প্রথম বার হাসলো - নবকৃষ্ণ ছেলেটা মনে হয় ভালোই।

'এই, নাড়ু খাবে - আমার ঠাম্মা না নাড়ু আর মোয়া দিয়েছে।'

একটা বড় ঝিলের পাশে সবাই দাঁড়ালো - কাহারদের একটু বিশ্রাম দরকার। ননী দেখলো কালো কালো লোকগুলোর সমস্ত গা ঘামে ভিজে চক চক করছে - ওরা রাস্তার ধারের ঘাসে বসে ঘাড়ের গামছা দিয়ে ঘাম পুঁছে ওটা নেড়ে নেড়েই হাওয়া খেতে শুরু করলো। একদম প্রথম গরুর গাড়ি থেকে বিশ্বম্ভর দেখলেন মাঝের গাড়ি থেকে ওর মেয়ে অনু নেমে বর নবীনের হাত ধরে দৌড়াচ্ছে পালকির দিকে - মাথার ঘোমটা খসে পড়েছে - এলো চুল হাওয়াতে উড়ছে - বড় সুখের সে দৃশ্য। মুচকি হেসে পাশে বসা চক্রবর্তী মশাইকে বললেন,

'কি চক্কোত্তি ভায়া, এদের দেখে কিছু মনে পড়ে?'

চক্রবর্তী মশাই থেলো হুঁকোতে একটা সুখ টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হাসলেন,

'সে আর বলতে - বিয়ের সময় গিন্নী তো ছয় বছরের ছিলো - আমি কিছুতেই সঙ্গে নিয়ে শোবো না - রাত্রে যদি বিছানা ভেজায় সেই ভয়ে। গিন্নীর আবার শেয়ালের ডাকে ভীষণ ভয় - রাত্রে শেয়াল ডাকলেই ভয়ে গুড়ি শুঁড়ি মেরে আমার প্রায় বুকের মধ্যে ঢুকে যেতো। বছর আষ্টেক বয়স হতে পূর্ণিমার রাত্রে আমরা জানালা টপকে পালিয়ে যেতাম মাঠে, খালের ধারে - গিন্নীকে অবশ্য কোলে করেই জানালা থেকে নামাতে ওঠাতে হতো। সেদিন কি আর আসবে ভায়া - এখন ছেলে মেয়েদের দেখেই আনন্দ পাই।'

এর মধ্যে অনু আর নবীন পৌছে গিয়েছে পালকির কাছে - দুজনে প্রায় এক সঙ্গে পালকির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে হেসে উঠলো - ওদের দেখে ননী কেমন কুঁকড়ে গেলো।

'এই দাদা, তখন থেকে দুজনে পালকির মধ্যে গুটি শুঁটি মেরে বসে আছিস - এবার তুই নামতো - আমি নতুন বৌএর সাথে যাবো - গরুর গাড়িতে কোমর ধরে গিয়েছে।'

নবীনের মুখে ফিচেল হাসি - চোখ মটকে বললো,

'কিরে নবা - বলি হচ্ছিলোটা কি দুজনে - আমরা যেন বুঝি না। তা নতুন বৌএর স্বাদ - -'

অনুর একটা জোর চিমটি খেয়ে নবীন উঃ করে উঠলো

'এই, তুমি ফাজলামি করো নাতো - অসভ্য কোথাকার - আনকোরা নতুন বৌ - তার সামনে যা তা বলবে না। ওমা আমাদের তো এখনও আলাপ হয়নি। বুঝলে বৌদি, আমি তোমার ননদ - বয়সে কিন্তু তোমার থেকে বড় - একদম রায় বাঘিনী - তোমাকে খুব চিমটি কাটবো কিন্তু! এটা আমার কর্তা - বুঝতেই পারছো ভীষণ ফাজিল - ওকে একদম পাত্তা দিও না।'

এর মধ্যে নবা পালকি থেকে নামতে নবীন ফোড়ন কাটলো,

'এই অনু, চলো না আমরা দুজনেই পালকিতে উঠি - -'

'ইল্লি আর কি - তোমাকে পালকিতে উঠতে দিচ্ছি আমি। দাদাকে নিয়ে সোজা পালাও গরুর গাড়িতে। আমি বৌএর সাথে গল্প করতে করতে যাবো।'

ওরা চলে যেতেই অনু ননীর গা ঘেঁসে বসলো,

'তোমার সাথে বাসরে তো গল্প করাই হলো না - তুমি তো ঘুমিয়ে কাদা। অবশ্য সারাদিন যা ধকল গিয়েছে - আমি তো বুঝি। আমার বিয়ের বাসরে আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর তোমার নন্দাই না চিমটি কেটে কেটে আমাকে তুলেছিলো - আমার ভীষণ রাগ হয়েছিলো - ওর হাতে কামড়ে দিয়েছিলাম।'

বলেই অনু হেসে গড়িয়ে পড়লো তারপর ননীর গালে চুক করে একটা চুমু খেয়ে বললো,

'তোমাকে না আমার খুব পছন্দ হয়েছে - এই, তুমি আমার মৌটুসি হবে? আমি বাপের বাড়ি থাকলে তোমার সাথে খুব খেলবো - আমার পুতুল গুলো তোমাকে দিয়ে যাবো।'

তারপর ফিক করে হেসে বললো,

'তোমার নন্দাই আমাকে থাকতে দিলে তো - ও যাবার সময় আমাকে কোন একটা

বায়নাক্কায় ঠিক টেনে নিয়ে যাবে। আমি না থাকলে ওর মনটা নাকি কেমন হুঁ হুঁ করে - তখন পড়া না করে খালি মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া আমাকে ছাড়া শাশুড়ী মায়ের সংসার অচল। দাদার বিয়ের জন্যই কটা দিন ছাড়া পেয়েছি।'

ননীর ননদিনী ভয় কেটে গিয়েছে - অনু কি সুন্দর ওকে আপন করে নিয়েছে। মুখ তুলে হাসলো,

'তোমাকেও না আমার খুব ভালো লাগছে।'

গল্পে গল্পে সময় কেটে যাচ্ছে - ওরা এখন একটা গ্রামে ঢুকেছে। রাস্তার পাশের একটা বড় পুকুরে অনেক গুলো ছেলে জলে হুড়োহুড়ি করছিলো - পালকি দেখে জল থেকে উঠে দৌড়ে এদিকের পাড়ে এলো - সব কটাই পুরো ন্যাংটো। ননীর মুখ লাল হয়ে গেলো,

'এই মৌটুসি, ছেলে গুলো কি ভীষণ অসভ্য।'

অনু ফিক করে হেসে ননীর গালটা টিপে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বললো,

'একদম নতুন বৌ তো - তাই বিচ্ছিরি লাগছে। কিছুদিন যাক আর লাগবে না।'

ব্যাপারটা ননীর মাথায় ঠিক ঢুকলো না। ওদের শোভাযাত্রা গ্রামের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলেছে - কারুর উঠোনের পাশ দিয়ে, কারুর গোয়ালের গা ঘেঁসে, কলাবাগানের মাঝে দিয়ে। বৌ ঝিরা বাড়ির কাজ ফেলে দাওয়া থেকে, উঠানের বাঁশের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে। বাচ্চা ছেলেরা মেয়েরা দৌড়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে - অনেকে একহাতে ইজের সামলাতে সামলাতে এসেছে। গ্রামের পাটশালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেলো পড়োদের একসাথে চেঁচিয়ে এক-এক্কে-এক, এক-দুগুণে-দুই পড়া আর পণ্ডিত মশাই ছোট মনোহারি দোকান চালাতে চালাতে হাতে বেত নিয়ে পড়াচ্ছেন। পুকুর পাড়ে কোন বাড়ির বৌ বাসন মাজতে মাজতে শোভাযাত্রা দেখে তাড়াতাড়ি এঁটো হাতের গোছে মাথার ঘোমটা আর গায়ের কাপড় ঠিক করে নিলো। গ্রামের হাট আজ নেই তাই বাজার প্রায় ফাঁকা - এধার ওধার তরকারির খোসা, আবর্জনা ছড়িয়ে - ঘেঁয়ো কুকুর গুলো শাল পাতা চাটছে। এই রকম কত ছবি ননীর চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে গেলো ওর মনের গভীরে দাগ কেটে। গ্রামের পর আবার মাঠ - বর্ষার কাদা শুকিয়ে একেবারে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ফলে গরুর গাড়ি ও পালকি অনেক ধীরে চলেছে। ওরা দুজনেই এ ওর ঘাড়ে মাথা রেখে পালকির দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎই অনেক গলার আওয়াজ, শাঁখ আর উলু ধ্বনিতে ঘুম ভেঙ্গে গেলো - অনু একটু উঁকি মেরেই বললো,

'আরে বাপরে, আমরা তো পৌছে গেছি - এই মৌটুসি চটপট তোকে ঠিক করে দি।'

বলে ননীর শাড়ি গোছ গাছ করে মাথার ঘোমটা লম্বা করে টেনে হাতে সিঁদূরের গাছ কৌটটা ধরিয়ে দিলো।

'ভয় নেই, চুপ করে বসে থাক - এবার সবাই তোকে বরণ করতে আসবে - দেখি দাদা কোথায় গেলো - তোদের তো জোড়াতেই নামতে হবে।'

বলে পালকি থেকে বেরুতেই কয়েক জন মহিলা বলে উঠলো,

‘এ কি রে অনু - তুই কেন বৌএর সাথে - নব কোথায়?’

বলতে বলতে নবকৃষ্ণ দৌড়ে এসে পালকিতে উঠেই গাটছড়ার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলো। ননী এখন ভয়ে প্রায় কাঁপছে - এক্ষুনি শাশুড়ী ডাঙ্গস হাতে আসছে - তারপর? ভয়ে নবকৃষ্ণর হাত চেপে ধরেছে। এক মহিলা প্রদীপ হাতে পালকির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে আস্তে করে ঘোমটা তুলে থুতনিতে হাত দিয়ে ননীর মুখ তুলে ধরেছেন - ভয়ে ননীর চোখ বন্ধ, ঠোঁট কাঁপছে।’

‘আহা, কি সুন্দর মেয়ে গো - ভয় পেয়েছো কেন? তাকাও।’

আস্তে আস্তে ননী চোখ খুলে তাকাতে দেখলো এক সুন্দর ঢলঢলে মুখের মহিলা - চোখ দিয়ে স্নেহ ঝরে পড়ছে - ওই চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ওর ভয় কেটে গেলো - ননীর গালটা টিপে কপালে ছোট্ট একটা চুমু খেয়ে বললেন,

‘নব, তোর কপালটা খুব ভালো রে তাই এমনি সুন্দর বৌ পেয়েছিস। বৌমা, আমি তোমার শাশুড়ী - নবর মা - আস্তে আস্তে নেমে এসো।’

বলে প্রায় কোলে করেই ননীকে পালকি থেকে নামিয়ে আনলেন - পেছন পেছন নবকৃষ্ণও নেমে এলো। আর এক বয়স্কা মহিলা এগিয়ে এসে ঘোমটা তুলে ননীর মুখ দেখে বললেন,

‘আরে এত দেখছি বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা - দশ্যি নবর কপালটা খুব ভালো বৌমা।’

ধীরে ধীরে দুধ ও আলতা মেশানো থালায় পা রেখে ছোট ছোট পায়ে দুধে আলতার ছাপ ফেলে ননী শ্বশুর বাড়িতে ঢুকলো।

\- - - - - - - - - -

বৃদ্ধাশ্রমের দোতলার বারান্দায় বসে নিভাননী দেবী সামনের রাস্তার মানুষ ও গাড়ির ভীড়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন - সারাটা দিন ওর এই রাস্তা দেখেই কেটে যায়। পুরাতন দিন গুলো সিনেমার ছবির মত নানা ঘটনার পসরা সাজিয়ে টুকরো টুকরো ভাবে চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যায় - কিছু আনন্দে, সুখে রঙ্গীন তবে বেশীর ভাগই দু:খে কালো - ওরাই এখন ওর এক মাত্র সঙ্গী। নিভাননীর আপন বলতে একমাত্র নাতি সেও এখান থেকে তল্পি তল্পা গুটিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে তাই যাবার আগে ঠামিকে এই বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে আসে। ভর্তি করার সময় নাম জানতে চেয়েছিলো - জীবনে এই প্রথম কেউ ওর নাম জিজ্ঞেস করলো। স্মৃতির অতল গভীরে অনেক হাঁতড়ে খুঁজে পেলেন বহু সযতনে গোপন কুঠরিতে লুকিয়ে রাখা সেই নাম - ননী। নামটা শুনে নাতি মুচকি হেসে ওর এই নতুন নাম নিভাননী দেবী খাতায় লিখিয়ে দেয়।

সেই ছোট্ট ননী ছিয়াশীটা বছর পেরিয়ে জীবনের শেষ বেলায় এই বারান্দাতেই অপেক্ষায় বসে থাকেন - কখন ওই রাস্তার মোড়ে সেই চার কাহারের পালকিটা আবার ফিরে আসবে ওকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

অঞ্জন নাথ